Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

Doi https://doi.org/10.67841/pgp.260501026 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Contribution of the 'Kapaṭavipāṭikā' Commentary to the Exegesis of the Invocation Verses of the 'Rāghavapāṇḍavīya' Epic

রাঘবপাণ্ডবীয় মহাকাব্যের মঙ্গলশ্লোক ব্যাখ্যানে কপাটবিপাটিকা টীকার অবদান

Sonali Roy
Researcher
Sanskrit Department
Jadavpur University

Received on: 18th April 2026
Accepted on: 30th April 2026

Abstract:

Indian culture is replete with diverse varieties. The concept of 'samskara' (sacramental rite) is inextricably linked with this culture. Offering hymns of praise or performing auspicious rituals to one's chosen deity ('Ishtadevata') at the commencement of any undertaking constitutes a specific form of 'samskara'. The practice of performing an 'Mangalacharan' — an invocation of auspiciousness — at the beginning of a literary work is a hallmark of Indian culture. Theistic scholars of scripture believe that offering praise to one's chosen deity at the outset of a book ensures its completion without any impediments. In other words, the 'Mangalacharan' serves a dual purpose: it acts simultaneously as a remover of obstacles and as the catalyst for the successful conclusion of the work. Consequently, they perform the 'Mangalacharan' ritual at the inception of any endeavor, including the commencement of a literary text. For ages, the 'Mangalacharan' has upheld the norms of etiquette and tradition within Indian culture. Thus, to uphold these standards of propriety and to ensure the unhindered completion of their works, scholars have deemed the inclusion of a 'Mangalacharan' at the beginning of a book to be an absolute necessity. Furthermore, with the specific intent of instructing their disciples, they advocated for the compilation of such invocations at the very beginning of a text. The great poet and scholar, Kaviraj Pandit, was no exception to this tradition; taking into consideration both the successful completion of his work and the pedagogical needs of his disciples, he, too, offered hymns of praise to his chosen deity at the very inception of his book. In the realm of Sanskrit literature, the 'Dvisandhan Kavya' — poetry capable of yielding a double meaning — is held in high esteem. Any poetic composition in which a single verse or phrase simultaneously conveys two distinct meanings is classified as a 'Dvisandhan Kavya'. Among the works within this tradition that have been cherished and studied with reverence since antiquity, a preeminent position is occupied by the epic 'Raghavapandaviya', authored by Kaviraj Pandit. The epic simultaneously narrates the saga of "Raghav" — that is, the story of Rama — and, with equal prominence, the tale of the "Pandavas" — the epic narrative of the 'Mahabharata'. Through this very title, the poet effortlessly apprised his readers of the dual subject matter explored within the work. Subsequently, in order to render the intricate stylistic artistry of this epic more accessible and comprehensible to readers, various commentaries ('tikas') were composed based upon it; among these, the 'Kapatavipātika' commentary — authored by the scholar Premchandra Tarkabagish — stands out as a particularly significant and notable contribution. Through the brilliance of his interpretive artistry — manifested in his elucidation of the ambiguous and abstruse verses of the 'Raghava-Pandaviya' epic, as well as in the clarity and elegance he imparts to its vocabulary—the commentator has successfully instilled in the reader's heart a profound aesthetic appreciation for this work. The poet-author, Kaviraj Pandit, included seven invocatory verses ('Mangalacharan') at the very inception of his 'Raghava-Pandaviya' to ensure the auspicious and unhindered

© Santiniketan Sahityapath

completion of the text. Through his distinctive style of composition, the commentator, Tarkavagish, has rendered these invocatory verses — originally embedded within the text—readily accessible and comprehensible to the reader. The primary objective of the present article is to analyze the invocatory verses of the 'Raghava-Pandaviya' epic through the interpretive lens of the 'Kapatavipātika' commentary authored by Acharya Premchandra Tarkavagish.

Key Words:
Rāghavapāṇḍavīya, Kapaṭavipāṭikā, Tarkavāgīśa, Commentator, Epic, Invocation.

মূল প্রবন্ধ

ভারতীয় সংস্কৃতি নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়। এই সংস্কৃতির সহিত 'সংস্কার' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো কার্যের প্রারম্ভে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিও একপ্রকার সংস্কারবিশেষ। ইহা সংস্কৃতশাস্ত্রে মঙ্গালাচরণ নামে অভিহিত। মঙ্গাল শব্দের অর্থ হলো 'শুভ'।[১] ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র। লক্ষ করলে দেখা যায়, ভারতীয় আস্তিক সাহিত্যিকগণ তাঁদের কার্যারম্ভে তথা গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ ক্রিয়া করেন। মহাকবি কবিরাজ পণ্ডিত তার ব্যতিক্রম নয়। বলাবাহুল্য, কেবলমাত্র কোনো কাব্যিক নয়, ভারতীয় সকল আস্তিক শাস্ত্রকার তাঁদের গ্রন্থ সূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ ক্রিয়া করেন। অর্থাৎ ভারতীয় আস্তিক শাস্ত্রকারগণের একটি স্বভাবসিদ্ধ বিষয় হলো গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা। যে সকল সম্প্রদায় বেদকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করেন, তাঁরা হলেন আস্তিক। আর যাঁরা বেদকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করেন না, তাঁরা নাস্তিক।[২] ইষ্টদেবতার স্মরণপূর্বক স্তুতিই এককথায় মঙ্গালাচরণ নামে অভিহিত। গ্রন্থারম্ভে এই মঙ্গালাচরণ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কেন গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ করব? আস্তিক শাস্ত্রকারগণ মনে করেন, গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে যদি ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি তথা মঙ্গালাচরণ করা হয়, তাহলে তার দ্বারা গ্রন্থের নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি সম্ভব। অর্থাৎ মঙ্গালাচরণ একাধারে যেমন বিঘ্ননাশের কারণ হয়, তেমনি গ্রন্থসমাপ্তিরও কারণ হয়। তবে এবিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য লক্ষিত হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিঘ্নধ্বংসকে মঙ্গালের ব্যাপারস্বরূপ উল্লেখ করে মঙ্গালকে গ্রন্থসমাপ্তির কারণ মানলেও নবীন আচার্যগণ কেবলমাত্র বিঘ্নধ্বংসকে মঙ্গালের ফল বলেছেন। তাঁদের মতে, গ্রন্থসমাপ্তি গ্রন্থকারের বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি কারণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, সেখানে মঙ্গালের আবশ্যকতা নেই। মঙ্গালের দ্বারাই কেবল বিঘ্নের নাশ হয়।[৩] যাইহোক, মঙ্গালের কার্যবিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও মঙ্গাল যে নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি কারণ, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র কোনো গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে নয়, যে-কোনো শুভকর্মের প্রারম্ভে এই মঙ্গালকর্ম সম্পন্ন হয়, তা আস্তিক শাস্ত্রকারগণ কখনো উপেক্ষা করতে পারে না। যুগ যুগ ধরে এই মঙ্গালাচরণ ভারতীয় সংস্কৃতির শিষ্টাচার তথা ঐতিহ্য বহন করে আসছে। কোনো কার্যসূচনার প্রারম্ভে ইষ্টদেবতা কিংবা গুরুগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার করা হলো শিষ্টাচার-বিশেষ। তাই আস্তিকগণ নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি ও শিষ্টাচার রক্ষার্থে মঙ্গালাচরণকে আবশ্যকরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে কেন তা সংকলিত হবে? তার কারণরূপে শাস্ত্রকারগণ শিষ্যশিক্ষার কথা বলেছেন। 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে এপ্রসঙ্গো উদ্ধৃত হয়েছে — "বিঘ্নবিঘাতায় কৃতং মঙ্গালং শিষ্যশিক্ষায়ৈ নিবধ্নাতি।"[৪] অর্থাৎ গ্রন্থের বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত কৃত মঙ্গালাচরণ শিষ্যশিক্ষার জন্য গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে সংকলিত করা আবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, সুষ্টভাবে তথা বিঘ্ননাশপূর্বক গ্রন্থসমাপ্তির নিমিত্ত যেমন মঙ্গালবাক্যের স্তুতি আবশ্যক, তেমনি শিষ্যশিক্ষার অভিপ্রায়ে গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ বাক্যটিকে লিপিবদ্ধ করাও বাঞ্ছনীয়। তবে নাস্তিক ব্যক্তিবর্গের মতে, মঙ্গালাচরণ কখনই বিঘ্ননাশ বা গ্রন্থসমাপ্তির কারণ হতে পারে না। তাঁদের মতে, কোনো গ্রন্থের বিঘ্নের বিনাশ ও গ্রন্থসমাপ্তির কারণ যদি মঙ্গালাচরণই হয়, তাহলে 'কাদম্বরী' গ্রন্থ কেন নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হলো না? সেখানে তো গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আবার মঙ্গালাচরণ ক্রিয়ার অভাব সত্ত্বেও কীভাবে 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হলো? তাই তাঁরা বলেন, মঙ্গালাচরণ কখনই বিঘ্ননাশের বা গ্রন্থসমাপ্তির কারণ হতে পারে না। নাস্তিকদের এরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেন — "কাদম্বর্যাদৌ বিঘ্নবাহুল্যাৎ সমাপ্ত্যভাবঃ, কিরণাবল্যাদৌ তু গ্রন্থাদ্ বহিরেব মঙ্গালং কৃতমতো ন ব্যভিচারঃ।"[৫] অর্থাৎ 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গালের তুলনায় বিঘ্নের আধিক্যহেতু সেখানে নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির অভাব লক্ষিত হয়। আবার 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গালাচরণ হয়নি, তা বলা যায় না। কেননা, সেখানে মঙ্গালাচরণ হয়েছে, কিন্তু শিষ্য শিক্ষারূপ যে শিষ্টাচার, তা প্রস্ফুটিত হয়নি। অর্থাৎ সেখানে মঙ্গালাচরণ ক্রিয়া হলেও তা গ্রন্থারম্ভে সংকলিত হয়নি। আচার্য বিশ্বনাথের মতে, যে-সকল গ্রন্থ সূচনার প্রারম্ভে মঙ্গালাচরণ শ্লোক লক্ষিত হয় না, সেখানে জন্মান্তরীয়

© Santiniketan Sahityapath

মঙ্গালাচরণ স্বীকার্য। এ প্রসঙ্গো 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে তিনি বলেছেন — "যত্র মঙ্গালং ন দৃশ্যতে তত্রাপি জন্মান্তরীয়ং তৎ কল্প্যতে। যত্র চ সত্যপি মঙ্গালে সমাপ্তির্ন দৃশ্যতে, তত্র বলবত্তরো বিঘ্নপ্রাচুর্য্যং বা বোধ্যম্।"[৬] অর্থাৎ যে গ্রন্থের আদিতে মঙ্গালাচরণ লক্ষিত হয় না, সেখানে জন্মান্তরীয় মঙ্গাল স্বীকার করতে হয়। আবার যেখানে মঙ্গালের উপস্থিতি সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির অভাব লক্ষিত, সেখানে মঙ্গালের তুলনার বিঘ্নের আধিক্য বা বিঘ্নের প্রাচুর্যতার কারণে গ্রন্থসমাপ্তির অভাব দেখা যায়। তাই ভারতীয় আস্তিক শাস্ত্রকারগণের মতে, নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির হেতু গ্রন্থারম্ভে মঙ্গালাচরণ করা অবশ্যই কর্তব্য। আর শিষ্যশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে তা সংকলিত করা উচিত। এই মঙ্গালের দ্বারাই বিঘ্নের বিনাশ সম্ভব। যেহেতু 'সমাপ্তিকামো মঙ্গালমাচরেৎ'এরূপ শ্রুতিবাক্য উল্লেখের দ্বারা শ্রুতিতে মঙ্গালই গ্রন্থসমাপ্তির কারণরূপে উল্লিখিত হয়েছে। তাই আচার্য বিশ্বনাথ বিঘ্নধ্বংসরূপ কার্যের প্রতি মঙ্গালই একমাত্র কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭]

আশীর্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দেশক ভেদে মঙ্গালাচরণ ত্রিবিধ। এর মধ্যে নমস্কারমূলক মঙ্গালাচরণ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ মঙ্গালাচরণের মধ্যে শাস্ত্রকারগণ যে-কোনো এক বা একাধিক মঙ্গালাচরণ করতে পারেন। তবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শাস্ত্রকারগণ নমস্কারমূলক বাচিক মঙ্গালাচরণ করলেও সেখানে বস্তুনির্দেশকমূলক মঙ্গালেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেহেতু প্রয়োজন বিনা কোনো ব্যক্তি কোন কর্মে প্রবর্ত্তিত হয় না, তাই সহৃদয় পাঠক কেন এই গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হবে? মঙ্গালের মধ্যে যদি সে বিষয়ে উপস্থাপন করা যায় অর্থাৎ প্রবৃত্তির কারণ যদি মঙ্গালে উল্লিখিত হয় তাহলে সেই গ্রন্থ সহজেই সহৃদয় পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাই শাস্ত্রকারগণ গ্রন্থসূচনার প্রারম্ভে ইষ্টদেবতা তথা গুরুকে স্মরণপূর্বক নমস্কারমূলক মঙ্গালের সঙ্গো বস্তুনির্দেশকমূলক মঙ্গালও করে থাকেন। তবে কোনো গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে কীধরণের মঙ্গালাচরণ ক্রিয়ার দ্বারা গ্রন্থের শুভারম্ভ করবেন? তা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে দ্বিসন্ধান শ্রেণির কাব্য অত্যন্ত সমাদৃত। যে কাব্যে একটি পদের দ্বারা দ্বিবিধ অর্থ স্ফুটিত হয়, তা দ্বিসন্ধান পদবাচ্য। এই দ্বিসন্ধান কাব্যপরম্পরায় যেসকল কাব্যের নাম সমাদরে চর্চিত হয়ে আসছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো কবিরাজ পণ্ডিতকৃত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' মহাকাব্য। গ্রন্থকার সুনিপুণ দক্ষতায় তাঁর কাব্যকে একইসঙ্গো দ্বিবিধ অর্থের বাহক করে তুলেছেন। 'রাঘব' অর্থাৎ রামকথা বা রামায়ণের বিষয় একাধারে কাব্যটিতে যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সমভাবে বর্ণিত হয়েছে 'পাণ্ডব' তথা মহাভারতগাথা। উক্ত নামকরণের মধ্য দিয়েই কাব্যের আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে কবি অবগত করেছেন সহজেই। অর্থাৎ একই শ্লোকের মধ্য দিয়ে কবি রাম ও পাণ্ডব — উভয় ক্ষেত্রের বর্ণনা করেছেন সমভাবে। পরবর্তিতে এই মহাকাব্যের রচনাশৈলীর নৈপুণ্যতাকে পাঠকের নিকট সহজবোধ্য করার নিমিত্ত উক্ত কাব্যাশ্রয়ে যে-সকল টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রণীত 'কপাটবিপাটিকা' টীকা। টীকাকার আপন তুলির টানে তথা নিজস্ব রচনাকৃতির দ্বারা দ্ব্যর্থক দূরূহ 'রাঘবপাণ্ডবীয়' মহাকাব্যস্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও কাব্যস্থিত পদরাশির অর্থসারল্য ও মাধুর্যের মধ্য দিয়ে পাঠকহৃদয়ে এই গ্রন্থপাঠের প্রতি রসের সঞ্চার করেছেন। যাইহোক, কাব্যকার কবিরাজ পণ্ডিত নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁর 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক গ্রন্থ সূচনার প্রারম্ভে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি তথা মঙ্গালাচরণস্বরূপ সাতটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। এবিষয়ে নিম্নে বর্ণিত হলো —

স্বাধিষ্টানাম্বুজরজঃপুঞ্জপিঞ্জরমূর্ত্তয়ে।
ইচ্ছাধীনজগত্সৃষ্টিকর্মণে ব্রহ্মণে নমঃ।। শ্লোক ১

আলোচ্য শ্লোকের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার নানাবিধ গুণের উল্লেখপূর্বক সমগ্র জগৎ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকে স্তুতি করলেন। এককথায়, গ্রন্থকার নমস্কারাত্মক মঙ্গালের মধ্য দিয়ে উক্ত গ্রন্থের শুভ সূচনা করতে প্রয়াসী হলেন। গ্রন্থকার কর্তৃক মঙ্গালশ্লোক উল্লেখের কারণ ব্যাখ্যানে টীকাকার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন — "রাঘবপাণ্ডবীয়াভিধং মহাকাব্যমারভমাণস্তত্-সমাপ্তিপ্রতিবন্ধকীভূতমান্-মনঃ প্রত্যূহব্যূহমাশঙ্কা তদ্বিঘাতায় কৃতমপি নানাদেবতোপাসনারূপং মঙ্গালং শিষ্যশিক্ষার্থমুপনিবন্ধন্ সুরজ্যেষ্ঠত্বাত্ প্রথমং ব্রহ্মাণমুপশ্লোকয়তি।"[৮] অর্থাৎ গ্রন্থকার কবিরাজ পণ্ডিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক যে মহাকাব্যের প্রারম্ভ করতে উদ্যত হয়েছেন, নির্বিঘ্নে সেই কার্যের পরিসমাপ্তি হেতু তিনি নানান দেবতার স্তুতি করেছেন এবং শিষ্যশিক্ষার নিমিত্ত সেই মঙ্গালগুলিকে গ্রন্থারম্ভে লিপিবদ্ধ করেছেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তিই মঙ্গালের মূল অভিধেয়। আর গ্রন্থারম্ভে তার লিপিবদ্ধতার কারণ হলো শিষ্যশিক্ষা। টীকাকারও তাঁর রচনায় বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে আলোচ্য শ্লোকে সে কথাই ব্যক্ত করলেন। কিন্তু গ্রন্থকার কেন সর্বাগ্রে

© Santiniketan Sahityapath

ব্রহ্মার স্তুতি করলেন? এবিষয়ে টীকাকার বললেন, মঙ্গালস্বরূপ তিনি (গ্রন্থকার) যে সকল দেবতার স্তুতি করেছেন, তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠ হওয়ায় গ্রন্থকার সর্বপ্রথম ব্রহ্মাকে নমস্কার করেছেন।

এই ব্রহ্মা কেমন গুণসম্পন্ন? গ্রন্থকার কবিরাজ পণ্ডিত উক্ত শ্লোকের ছত্রে ছত্রে ব্রহ্মার গুণের বর্ণনা করেছেন। এপ্রসঙ্গো তিনি বলেছেন, যিনি পদ্মের উপর বিরাজমান, সেই পদ্মের পরাগজাত হলুদ বর্ণের ফলে যার শরীর হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে, ফলে সেই পদ্ম হয়েছে অন্যান্য পদ্মের তুলনায় অধিক শোভিত। এছাড়াও যিনি কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছায় এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় এবিষয়ে আলোচনাকালে বলেন — 'নিজাভিলাষমাত্রস্য নতু কুলালাদেরিব কায়িকক্লেশস্য অধীনম্ আয়ত্তং জগতো বিশ্বস্য সৃষ্টিকর্মং নির্মাণকার্য্যং যস্য স তথা তস্মৈ।' অর্থাৎ টীকাকার এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, গ্রন্থকার জগতের সৃষ্টিকর্তাস্বরূপ ব্রহ্মার স্তুতি করলেও পরমাত্মা ব্রহ্মা কিন্তু কুম্ভকারদের ন্যায় কায়িক বা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি করেন নি। এই জগৎ যাঁর ঐচ্ছিক বা অভিলষিত মাত্র। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা বা অভিলাষেই এই জগতের প্রাদুর্ভাব, এখানে সেই ব্রহ্মাই স্তুত। যদিও গ্রন্থকার কেবলমাত্র বলেছিলেন তিনি জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকে নমস্কার করছেন, পরন্তু জগৎ কেমন ব্রহ্মজন্য? টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় তা নিপুণতার সহিত বর্ণনা করেছেন শ্লোকস্থ টীকায়। আবার কবির দ্বারা ব্রহ্মাকে স্তুতি করার কারণব্যাখ্যানে তিনি বলেন — 'ব্রহ্মা স্বেচ্ছয়া জগন্নির্মিমীতে কাব্যমপি জগদন্তর্গতং ভবিষ্যতি তস্মাদেতস্মিন্নপি কিঞ্চিদিচ্ছাং বিদধাত্বিতি কবেরভিলাষিতো ধ্বনিতঃ।' অর্থাৎ ব্রহ্মা যেহেতু স্বেচ্ছায় জগতের নির্মাণকারী, আর এই কাব্যও তাঁর নির্মিত জগতেরই অন্তর্গত একটি সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হবে, সেকারণে উক্ত কাব্যের দ্বারা যাতে কবির কিছু কামনা সফল হয়, সেকারণে কবি এখানে ব্রহ্মাকে স্তুতি করছেন।

পুনাতু বঃ সরস্বত্যাবিলাসশিশুকঃ শুকঃ।
তলাংশুময়-মাণিক্য-পঞ্জরান্তরগোচরঃ।। শ্লোক ২

প্রথম শ্লোকে জ্যেষ্ঠ দেবতার স্তুতি করার অনন্তর আলোচ্য শ্লোকে গ্রন্থকার বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর নিকট সহৃদয় পাঠকদের পবিত্র করার নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা করে স্তুতি করেছেন। এটি হলো আশীর্বাদাত্মক মঙ্গালশ্লোক। টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় এপ্রসঙ্গো বলেছেন — 'নমস্কাররূপং মঙ্গালমুক্তা আশীর্বাদরূপং মঙ্গালং কুর্বন্ বাঙ্ময়াধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং উপশ্লোকয়ন্ প্রার্থয়তে।' অর্থাৎ নমস্কারাত্মক মঙ্গালের অনন্তর আশীর্বাদাত্মক মঙ্গালস্বরূপ বাঙ্ময়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর স্তুতি করছেন গ্রন্থকার। তবে এখানে তিনি (গ্রন্থকার) সরাসরি সরস্বতীর নিকট স্তুতি না করে তাঁর করমধ্যস্থ শুকপাখির নিকট প্রার্থনা করেছেন। আর সেই পাখির বিরাজস্থান বর্ণনার প্রসঙ্গোই আসে বীণাপাণির প্রসঙ্গা। কেননা, এই শুকপাখি বাগদেবীরই। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন — 'সরস্বত্যাবিলাসশিশুকঃ শুকঃ।' অর্থাৎ সরস্বতীর বিলাসের নিমিত্ত পালিত শুকপাখি। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত 'শুক' বলতে *মহাভারতের* বক্তা শুকদেবকে বোঝালেও টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত মতের খণ্ডন করে বলেন, 'ভারতবক্তারং শুকদেবং স্তৌতীত্যাভাষ্য শুকঃ শুকদেব ইত্যাদি কেশাঞ্চিত্ ব্যাখ্যানমশ্রদ্ধেয়ং শুকদেবস্য ভারতবক্তৃত্বাভাবাত্ বৈশম্পায়নস্যৈব তথাত্বাত্।'[৯] অর্থাৎ কারো কারোর মতে, এখানে শুক বলতে মহাভারতের বক্তা শুকদেব স্তুত হয়েছেন, তবে এই মত অগ্রহণযোগ্য। কারণ, মহাভারতের বক্তা শুকদেব নন, বৈশম্পায়ন মুনি। অতএব তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে, গ্রন্থকার 'শুক' বলতে শুকপাখিকে বুঝিয়েছেন। কোথায় তাঁর অবস্থান? এপ্রসঙ্গো টীকাকার বিস্তৃত আলোচনাপূর্বক বলেছেন — 'সরস্বত্যাঃ করতলস্য যে অংশবোলোহিতকিরণাস্তন্ময়ং তদ্রূপং যন্মাণিক্যপঞ্জরং শোণমণিনির্ম্মিতং পক্ষিরক্ষণযন্ত্রং তস্য অন্তরং মধ্যং তস্য গোচরোবিষয়স্তন্মধ্যবর্তীত্যর্থঃ।' এককথায়, বীণাপাণি সরস্বতীর করতল থেকে নির্গত লাল বর্ণবিশিষ্ট যে কিরণ, এখানে সেই কিরণকেই গ্রন্থকার পিঞ্জর বা খাঁচার সঙ্গো তুলনা করেছেন। আর এই মাণিক্যপিঞ্জররূপ খাঁচার অভ্যন্তরেই তাঁর অবস্থানের কথা বলেছেন। তবে এখানে শুকপাখির স্তুতি করলেও প্রকারান্তরে গ্রন্থকার সরস্বতী দেবীকেই স্তুতি করছেন। টীকাকার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় এই প্রসঙ্গো বলেন, 'পক্ষিবিশেষস্য শুকস্য পবিত্রকারিত্বাভাবেঽপি উপাস্য দেবতাভ্যোঽভীষ্টশংসনাপেক্ষয়া তদ্গুণক্রিয়াপরিবারাদিস্তস্থা শংসনমধিকতরং বৈদগ্ধং দ্যোতয়তীতি কবিসম্প্রদায়ঃ।' অর্থাৎ পক্ষিবিশেষ শুকপাখির মধ্যে পবিত্রকারিত্বের অভাব বা পবিত্র করার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি উপাস্য দেবতার নিকট অভিষ্ট প্রার্থনা করার চেয়ে তাঁর গুণ, ক্রিয়া, পরিবার প্রভৃতির নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ বলে কাব্যিকগণ মনে করেন। আর একারণেই গ্রন্থকার 'শিশুকঃ শুকঃ' পদের প্রয়োগ করেছেন। শ্লোকস্থ 'শিশুক' পদের অর্থ নিরূপণার্থে টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় বলেছেন, 'কৃত্রিমপুত্রকরূপঃ।' অর্থাৎ গ্রন্থকার শুকপাখিকে সরস্বতীর পুত্রসম বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। 'সুবোধিনী' টীকায় এবিষয়ে

© Santiniketan Sahityapath

ব্যাখ্যাত হয়েছে, 'শিশুকঃ বালকঃ ইব।'[১০] অর্থাৎ গ্রন্থকার শুখপাখিকে বাগ্‌দেবীর পরিবারের অংশ তথা পুত্রসমরূপে স্বীকার করেছেন। তবে টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় এখানে একটি ভিন্ন মতের অবতরণ করে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন — 'বিনা পক্ষিণা লাসঃ ক্রীড়া বিলাসস্তত্র শিশুক ইত্যপরে।'[১১] অর্থাৎ তাঁর মতে, কেউ কেউ মনে করেন 'বিলাসঃ শুকঃ'এর অর্থ 'শুক বিনা ক্রীড়া' অর্থাৎ পক্ষী ব্যতীত যে ক্রীড়া, সেখানে যিনি শিশুর মত, এখানে সেই সরস্বতী দ্যোতিত। যাইহোক, উভয় মতের মধ্যে দিয়েই বীণাপাণি স্তুত। একারণে আলোচ্য শ্লোকের মধ্যদিয়ে গ্রন্থকার সরাসরি বীণাপাণির নিকট প্রার্থনা না করে তাঁর শুকপাখির নিকট অভিষ্ট প্রার্থনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙ্ময়ী দেবী সরস্বতীর নিকটই প্রার্থনা করেছেন। আর টীকাকার নিজস্ব রচনাকৃতির দ্বারা সেই মতকে পাঠকোপযোগী করে তুলেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলচ্ছদ্মপদ্মকুদ্মলদীর্ঘিকা
জায়তাং জগতঃ শান্ত্যৈ শাম্ভবী শক্তিরেকিকা।। শ্লোক ৩

কবি এখানে শিবের শক্তি তথা জলময়ী মূর্তির নিকট জগৎরক্ষার নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বন্দনা করেছেন। যদিও 'সুবোধিনী' টীকায় শিবের শক্তি বলতে পার্বতীকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পার্বতীর নিকট স্তুতির কথা বলেছেন।[১২] পরন্তু টীকাকার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় শিবের জলময় মূর্তিকে বুঝিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — "জলময়ীং শিবস্য মূর্ত্তিমুপশ্লোকয়ন্ প্রার্থয়তে।"[১৩] অর্থাৎ কবি শিবের জলময়ী মূর্তির নিকট প্রার্থনা করছেন। তিনি আরো বলেন, "একিকা অদ্বিতীয়া শাম্ভবী শিবসম্বন্ধিনী শক্তিঃ শিবস্য জলময়ী মূর্তিরিত্যর্থঃ জগতো লোকস্য শান্তৈ রক্ষণায় সুখায় বা জায়তাং ভবতু।"[১৪] অর্থাৎ শিবের জলময় মূর্তি জগৎ রক্ষায় ব্রতী থাকুক। আমরা জানি, সৃষ্টির আদিতে বিদ্যমান ছিল একমাত্র জল। আর এই জল শিবের অষ্ট মূর্তির মধ্যে অন্যতম। তাই কবি জগতের শান্তি, কল্যাণ, রক্ষা ও সুখের জন্য এখানে সেই জলরূপ শক্তির নিকট প্রকারান্তরে শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করছেন। এই শক্তি কেমন? টীকাকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন — 'ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমেব ছদ্ম ছলং যস্য তাদৃশং যত্ পদ্ম তস্য যঃ কুদ্মলোঽঙ্কুরীভাবেন প্রথমোত্পত্তিরিত্যর্থঃ তস্য দীর্ঘিকা বাপী জল এব ব্রহ্মাণ্ডস্য প্রথমাবির্ভাবাত্।' অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ছদ্মরূপ। এখানে কবি ব্রহ্মাণ্ডকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পদ্ম যেমন দিঘিতে প্রাদুর্ভূত, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্মের প্রথম প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত দিঘিস্বরূপ যে শিব, আলোচ্য শ্লোকের মধ্য দিয়ে সেই শিবের নিকট প্রার্থনা করেছেন গ্রন্থকার। যেহেতু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম প্রাদুর্ভাব জলেই, সেকারণে এখানে কবি ব্রহ্মাণ্ডকে পদ্মের সহিত তুলনা করেছেন। পদ্ম যেমন দিঘিতে প্রাদুর্ভূত, তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্মও জলময় শিবমূর্তি থেকে প্রকাশিত। টীকাকার অর্থসারল্যের মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

শ্লীলতালিঙ্গিতাঙ্গাস্য বিষ্ণুকল্পদ্রুমস্য বঃ।
অবতারমহাশাখাঃ ফলন্তু ফলমীপ্সিতম্।। শ্লোক ৪

কবি এখানে বিষ্ণুর স্তুতি করেছেন। যিনি কল্পবৃক্ষরূপে লতাস্বরূপ লক্ষ্মীর সহিত আলিঙ্গিত হয়ে অবস্থান করছেন। এখানে কবি সেই কল্পবৃক্ষরূপ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করছেন। কিন্তু কেন এই কল্পবৃক্ষরূপ বিষ্ণুর স্তুতি করছেন? তার কারণস্বরূপ কবি বলছেন — 'ফলমীপ্সিতম্' অর্থাৎ অভিষ্ট ফল লাভের আশায়। এপ্রসঙ্গে আলোচনাকালে টীকাকার বলছেন — 'অভীষ্টফলদাতৃতয়া সলক্ষ্মীকং নারায়ণমুপশ্লোকয়ন্ প্রার্থয়তে।' অর্থাৎ লক্ষ্মীর সহিত অধিষ্ঠিত নারায়ণ অভিষ্ট ফল প্রদান করেন বলে শ্রুতিবাক্য আছে। তাই কবি এখানে কল্পবৃক্ষরূপ নারায়ণের স্তুতি করছেন, অভীষ্ট ফললাভের আশায়। আর একারণে কবি সাধারণ নারায়ণের স্তুতি না করে কল্পবৃক্ষরূপ নারায়ণের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন। তবে কবি এখানে নিজের জন্য বা নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির জন্য কল্পবৃক্ষের স্তুতি করেন নি। কবি স্তুতি করছেন পাঠকের জন্য বা অধিকারীর জন্য। আর শ্লোকে 'বঃ' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তিনি তা অবগত করেছেন। অর্থাৎ পাঠক উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে যাতে নিজের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেন, সেকারণে কবি কল্পবৃক্ষস্বরূপ নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করেছেন। তবে এখানে তিনি নারায়ণের স্তুতি করেছেন ঠিকই, পরন্তু তিনি সরাসরি কল্পবৃক্ষের স্তুতি না করে সেই কল্পবৃক্ষের শাখাসমূহের নিকট প্রার্থনা করেছেন। কেমন শাখা? কল্পবৃক্ষের শাখা বলতে টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় নারায়ণের মৎস, কূর্মাদি অবতারকে বুঝিয়েছে। এবিষয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেছেন — 'নারায়ণরূপো যঃ কল্পদ্রুমস্তস্য যেঽবতারা মত্স্যকূর্মোদয়স্ত এব মহাশাখাঃ প্রধানবৃক্ষাঙ্গাবিশেষাস্তা বো যুষ্মাকং অভিলষিতং যত্ ফলং বর্গচতুষ্টয়ান্যতমরূপং উদ্দেশ্যং তদেব ফলং শস্যং তত্ ফলন্তু নিষ্পাদয়ন্তু দদত্বিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ একটি বৃক্ষের শাখা যেমন ফলপ্রদায়ী হয়, তেমনি কল্পবৃক্ষরূপ নারায়ণের মহাশাখাসমূহ তথা মৎস, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার পাঠকদের অভিষ্ট ফল তথা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বগ ফল দান করুক। অতএব বলা যায়, কবি এখানে আশীর্বাদাত্মক মঙ্গালাচরণ করেছেন।

© Santiniketan Sahityapath

কান্তিঃ শ্রীকণ্ঠকণ্ঠস্য জয়ত্যালিঙ্গানোত্সুকা।
স্কন্ধারূঢ়েব কালিন্দী মৌলিমন্দাকিনীর্য্যয়া।। শ্লোক ৫

আলোচ্য শ্লোকের মধ্য দিয়ে মহাকবি কবিরাজ পণ্ডিত ভগবান শ্রীকণ্ঠ তথা শিবের স্তুতি করেছেন। কিন্তু সেই শিব কেমন? কবি শিবের মহিমা বর্ণনায় বলছেন, যে শিবের মাথায় গঙ্গার বিরাজ এবং সেই বিরাজতার কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে কালিন্দী অর্থাৎ যমুনা শিবের কণ্ঠে বিরাজ করার জন্য কাঁধে চড়ে শিবের কণ্ঠ আলিঙ্গান করেছে, এখানে কবি সেই শিবকে প্রমাণ জানিয়েছেন। শ্লোকস্থ কালিন্দী শব্দের দ্বারা টীকাকার যমুনা এবং মন্দাকিনী পদের দ্বারা গঙ্গা নদীকে বুঝিয়েছেন।[১৫] আমরা জানি, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হলাহলও বিষপানের কারণে শিবের কণ্ঠ নীল। কিন্তু কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, বিষপানের কারণে শিবের কণ্ঠ নীলাভ নয়, বরং যমুনাকে তাঁর (শিবের) কণ্ঠে আশ্রয় দেওয়ার কারণেই তাঁর কণ্ঠ নীলাভ। যে শিব নিজ কণ্ঠে যমুনাকে আশ্রয় দেওয়ায় হেতু নিজকণ্ঠ নীলাভ করেছেন, এখানে কবি সেই শিবকেই স্তুতি করেছেন। টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় শিবকে 'সর্বজ্ঞানপ্রদানকর্তা' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন — 'সর্বজ্ঞানপ্রদং শিবমুপশ্লোকয়তি।' এককথায় বলা যায়, যমুনাকে নিজ গলায় আশ্রয় দিয়েছেন যে শিব, আলোচ্য শ্লোকে তাঁকেই প্রণাম জানিয়েছেন কবি। আর টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় শ্লোকস্থ পদরাশির অর্থব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে কাব্যটিকে মাধুর্যময়ী করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

স নঃ করোতু বিঘ্নানাং বারণং বারণাননঃ।
মদরাবিভিরারব্ধভোগাবলিরিবালিভিঃ।। শ্লোক ৬

গ্রন্থের বিঘ্নবিনাশের জন্য কবি এখানে বিঘ্নবিনাশকারী গণেশের স্তুতি করেছেন। শ্লোকস্থ 'বারণাননঃ' পদের দ্বারা কবি 'গজানন' তথা 'গনেশ'কে বুঝিয়েছেন। টীকাকার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় এপ্রসঙ্গে বলেছেন — 'সঃ বিঘ্নবিনাশকতয়া প্রসিদ্ধো বারণাননো গজাননঃ নোঽস্মাকং বিঘ্নানাং কাব্যকৃতি প্রতিবন্ধকীভূতদুরদৃষ্টানাং বারণং নিবারণং করোতু বিঘ্নানাং নাশয়ত্বিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ বিঘ্নবিনাশক নামে প্রসিদ্ধ যিনি, সেই গজানন আমাদের কাব্য রচনার প্রতিবন্ধকস্বরূপ সকল বিঘ্নের বিনাশ করুক। অতএব বলা যায়, আলোচ্য মঙ্গালশ্লোকের মধ্যে দিয়ে কবি বিঘ্নধ্বংসকে মঙ্গালের কার্যস্বরূপ মেনেছেন। আর এখানে কবি নিজের জন্য তথা নিজ গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য গজানন গণেশকে বন্দনা করেছেন।

জগত্প্রদীপযোবংশৌ সূর্যাচন্দ্রমসোরপি।
যযোরূদ্দীপিতৌ বাগ্ভিস্তৌ বন্দে কবিপুঙ্গাবৌ।। শ্লোক ৭

আলোচ্য শ্লোকের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর গুরুগণের উদ্দেশ্যে বন্দনা করেছেন। সূর্য ও চন্দ্র হলো সমগ্র জগতের প্রকাশক, কিন্তু সেই বংশদ্বয় যাঁদের রচনার দ্বারা উদ্দীপ্ত বা প্রকাশিত, সেই কবিশ্রেষ্ঠদ্বয়কে গ্রন্থকার কবিরাজ পণ্ডিত প্রণাম করেছেন। এখানে গুরু বলতে তিনি রামায়ণকার বাল্মীকি এবং মহাভারতকার বেদব্যাসকে বুঝিয়েছেন। কারণ, কবি যে গ্রন্থের সূচনা করতে চলেছেন, তা এই কবিদ্বয়ের অনন্য সৃষ্টি। মহর্ষি বাল্মীকি একাধারে সূর্যবংশীয় রাঘবদের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গ্রন্থে। অপরদিকে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডবদের কাহিনি। আর কবি আলোচ্য 'রাঘবপাণ্ডবীয়' গ্রন্থে যেহেতু রামকথা এবং মহাভারত গাথা একত্রে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তাই এখানে তিনি মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাসকে স্তুতি করেছেন। টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় এপ্রসঙ্গে বলেছেন—'জগত্প্রদীপয়োরপি জগতাং প্রকাশকয়োরপি সূর্যাচন্দ্রমসোর্বংশৌ অন্বয়ৌ যয়োর্বাগ্ভির্বচনৈঃ রামায়ণমহাভারতরূপৈদ্দীপিতৌ প্রকাশিতৌ তৌ কবিপুঙ্গাবৌ কবিশ্রেষ্ঠৌ বাল্মীকিব্যাসৌ অহং বন্দে নমামি।' অর্থাৎ জগতের প্রদীপস্বরূপ তথা জগতের প্রকাশক যে সূর্য ও চন্দ্র, সেই সূর্য ও চন্দ্রের বংশদ্বয় যে কবিদ্বয়ের বচনের দ্বারা তথা রামায়ণ ও মহাভারতের দ্বারা উদ্দীপ্ত বা প্রকাশিত, সেই কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ও ব্যাসকে নমস্কার করেছেন গ্রন্থকার। তবে কবি এখানে গুরুগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার করলেও বলা যায় প্রকারান্তরে এখানে তিনি বস্তুনির্দেশমূলক মঙ্গালাচরণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো গ্রন্থ রচনার প্রাক্কালে মঙ্গালাচরণ অবশ্যই কর্তব্য। কেননা, তার দ্বারা যেমন নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি ঘটে, তেমনি শিষ্যশিক্ষার প্রয়োজনও নিবৃত্ত হয়। আবার এর দ্বারাই পাঠক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ও জ্ঞাত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার কবিরাজ পণ্ডিত মঙ্গালাচরণের মাধ্যমে কেবল ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে নমস্কারই করেন নি, সেই সঙ্গে তিনি নিজ ইষ্টদেবতার নিকট যেমন আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, তেমনি আবার নিজ গুরুগণের উদ্দেশ্যে স্তুতিও করেছেন। একইভাবে বর্ণনা করেছেন নিজগ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ও। কারণ, আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পাঠক যদি অবগত না হয়, তাহলে গ্রন্থপাঠে আগ্রহ কমে। সেকারণেই তিনি

শুরুতে ইষ্টদেবগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেও অন্তিম মঙ্গলাচরণে সুকৌশলে প্রতিপাদন করেছেন আলোচ্য মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার শিষ্যশিক্ষার নিমিত্ত তিনি আলোচ্য গ্রন্থে একইসঙ্গে নমস্কার, আশীর্বাদ ও বস্তুনির্দেশ — সকল প্রকারের মঙ্গলাচরণ প্রয়োগ করেছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। কিন্তু কবির ভাষাকে সম্যক্‌ভাবে জানার জন্য আবশ্যক কাব্যে প্রযুক্ত পদরাশির যথার্থ অর্থ অন্বেষণ। আর এই অর্থের যথাযথ মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় টীকার। একজন টীকাকারই পারেন আপন তুলির টানে মহাকাব্যস্থ পদরাশির অর্থ সারল্যের মধ্য দিয়ে কাব্যকে রসাস্বাদনের উপযোগী করে তুলতে। টীকাকার তর্কবাগীশ মহাশয় এখানে তাই করেছেন। তিনি নিজস্ব রচনাকৃতির দ্বারা শ্লোকস্থ প্রতি পদের অর্থ ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে একাধারে গ্রন্থটিকে যেমন রসাস্বাদনের সহায়ক করেছেন, তেমনি করে তুলেছেন মহাকাব্যের রচনাশৈলীর নৈপুণ্যতাকে সহজবোধ্য ও বোধগম্য, যা পাঠককে সহজেই গ্রন্থপাঠের প্রতি আকৃষ্ঠ করে। টীকাকার সুনিপুণ দক্ষতায় কাব্যের অর্থ সারল্য ও মাধুর্যতার মধ্য দিয়ে দুরূহ দ্ব্যর্থক গ্রন্থটিকে করে তুলেছেন মাধুর্যময়ী।

তথ্যসূত্র:

১. Tri-Lingual Dictionary, পৃ. ২৮৯
২. ‘নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ’, মনুসংহিতা - ২.১১
৩. ‘বিঘ্নধ্বংসস্তু মঙ্গলস্য দ্বারমিত্যাহঃ প্রাঞ্চঃ। নব্যাস্তু মঙ্গলস্য বিঘ্নধ্বংস এব ফলম্। সমাপ্তিস্তু বুদ্ধি-প্রতিভাদি-কারণকলাপাত্।’ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ‘ভাষাপরিচ্ছেদ’, পৃ. ৮
৪. ওই, পৃ. ৪
৫. ‘তর্কসংগ্রহ’, সম্পাদক নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, পৃ. ১
৬. ‘ভাষাপরিচ্ছেদ’, পৃ. ৭-৮
৭. ‘মঙ্গলন্তু বিঘ্নধ্বংসবিশেষে কারণম্’, ওই, পৃ. ১০
৮. ‘কপাটবিপাটিকা’, ‘রাঘবপাণ্ডবীয়’, শ্লোক-১, সম্পাদক ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য, পৃ. ১-২
৯. ওই, শ্লোক- ২, পৃ. ৩
১০. ‘সুবোধিনী’, ওই, শ্লোক-২, সম্পা. দামোদর ঝা, পৃ. ২
১১. ‘কপাটবিপাটিকা’, ওই, শ্লোক- ২, সম্পাদক ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য, পৃ. ৩
১২. ‘শিবসম্বন্ধিনী শক্তিঃ পার্বতীত্যর্থঃ।’ ‘সুবোধিনী’, ওই, শ্লোক-৩, সম্পাদক দামোদর ঝা, পৃ. ২
১৩.’ কপাটবিপাটিকা’, ওই, শ্লোক-২, সম্পাদক ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য, পৃ. ৩
১৪. ওই, শ্লোক-২, পৃ. ৩
১৫. ওই, শ্লোক-৫, পৃ. ৪

সহায়ক গ্রন্থ:

- কবিরাজ পণ্ডিত, ‘রাঘবপাণ্ডবীয় (প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কৃত কপাটবিপাটিকা টীকা সহিত)’, সম্পাদক ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, কলকাতা: ১৮৪৭ শকাব্দ
- ....., ..., (সুবোধিনী ও সরলা ব্যাখ্যা সহিত), সম্পাদক দামোদর ঝ, বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৫
- অন্নংভট্ট, ‘তর্কসংগ্রহঃ’ সম্পাদক নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫ প্রথম প্রকাশ)
- ....., ..., সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (পুনঃ সংস্করণ, ১৪১০ তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)
- বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ‘ভাষাপরিচ্ছেদঃ (ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা সহিত)’, সম্পাদক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭০ প্রথম প্রকাশ)
- মনুসংহিতা, সম্পাদক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সদেশ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ)
- Tri-Lingual Dictionary. Ed. Govindagopal Mukhopadhaya & Gopikamohan Bhattacharya, Kolkata: Sanskrit College, 1966.

—

© Santiniketan Sahityapath